মুহূর্তের মহাসঙ্গ: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হারানো বই

যে-বছর বা হয়তো যেদিন 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি' বেরল, সে-বছর বা সেদিনই পনেরো-কুড়ি কপি বইয়ের একটা প্যাকেট নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কফিহাউসে ঢুকে আমার টেবিলে এসে বসলেন। বোধহয় চেনাজানা আর কাউকে না পেয়েই।

'আমার নতুন বই। আপনাকে দিলে আপনি নেবেন?'

উত্তেজনা অদৃশ্য রেখে শান্ত স্বরে বলেছিলাম, 'না দিলে আমাকে কিনতে হবে।' ঠিক এ-ই বলেছিলাম, স্পষ্ট মনে আছে। বোর্ড বাঁধাই, ম্লান রুপোলি বা প্রায় সিসে রঙের মলাট সেই বইটির কথা ভেবে আজও দুঃখ হয়।

দুঃখ হয়, বার বার বাসাবদলের ধকলে শত শত অমূল্য বইয়ের মতো এই বইটিও আর নেই। ওয়ার্ল্ড প্রেস, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং, রূপা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রভৃতি প্রকাশক ও পুস্তক বিপণন সংস্থা থেকে কেনা অসংখ্য বই আজ আমার কাছে শুধুই এক লুপ্ত সভ্যতা। কমলকুমার মজুমদার, বিনয় মজুমদারের দেওয়া সব বইও খুঁজে পাই না। স্বজন বন্ধুরাও দেখার ছলে হাত সাফাই করেছে। অনেকে পড়তে নিয়ে ফেরত দেয়নি। অনেক বই রহস্যজনক ভাবে উধাও। শুনেছি ভোরের ঠিকে কাজের মহিলা মাটির উনুন ধরাতে ঘুঁটের বিফলে বহু কষ্টে সংগ্রহ করা বইয়ের পাতা যথেচ্ছ ছিঁড়ে নিয়েছে।

গোরস্থানে রাত্রিবাস

ঢাকার সে সময়ের জনপ্রিয় পত্রিকা 'সচিত্র সন্ধানী' ও বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা 'সন্ধানী প্রকাশনী'র কর্ণধার গাজি সাহাবুদ্দিন এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। ছিলেন দু-তিন দিন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বীথিভাবি, কন্যা ও দুই নাতনি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সাগরময় ঘোষ ও এরকম আরও কেউ কেউ ঢাকায় গেলে গাজি পরিবারের প্রিয় ও পরম বাঞ্ছিত অতিথি। উষ্ণ পান-ভোজনে অতিথি আপ্যায়নের ঢালাও ব্যবস্থা। একবার গাজিসাহেবের বাড়িতে ঢাকার কয়েকজন তরুণ কবির আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে গেছি, আসরের মধ্যমণি শামসুর রাহমান প্রথম দর্শনেই আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'কবিতা-পরিচয়' আবার শুরু করা যায় না? পুরনো কপিও কি আর পাওয়া যায়?'

গাজিসাহেবের বাড়িতেই এক একুশে ফেব্রুয়ারি স্বনামধন্য পণ্ডিত ও সমাজ ইতিহাসবিদ আনিসুজ্জামানের সঙ্গে সমাজ সাহিত্য ইতিহাস জড়িত নানা প্রসঙ্গে

গভীর আড্ডায় আলোচনায় কাটিয়ে রাত বারোটার আগেই রাস্তার জনজোয়ারে পা মিলিয়েছিলাম। তখনও পদাতিক ভিড় তেমন শুরু হয়নি, তখনও রাস্তায় তরুণ-তরুণীদের আলপনা দেওয়ার কাজ চলছে।

অনেক দিন পর ক্যানসার আক্রান্ত গাজির লিখিত অনুমতি নিয়ে, পরে আমার প্রতিষ্ঠিত ও অকাল প্রয়াত দৈনিকপত্র 'নারীযুগ'-এ শহীদমাতা জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' ধারাবাহিক প্রকাশ করি। গাজির 'সন্ধানী প্রকাশনী'ই বইটির প্রকাশক।

সেই গাজিসাহেবকে সপরিবার অতিথি পেয়ে একদিন সুনীলদাকে সন্ধের পানাহারে নিমন্ত্রণ করি।

এসব আড্ডায় যেমন হয়, এক প্রসঙ্গ থেকে আরেক প্রসঙ্গে কথা গড়িয়ে যায়। সে ভাবেই কথা উঠল নানা জায়গায় ক্রমবর্ধমান হোটেল-খরচ নিয়ে।

কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনে, শঙ্খ ঘোষ ও আরও কয়েকজন ছিলেন, 'গৌরযাযাবর' বইটির জন্য পুরস্কার গ্রহণ বাবদ আমিও ছিলাম, কথায় কথায় একসময় বেড়ানোর কম খরচের হোটেল প্রসঙ্গ উঠল। আমি বললাম, ভুটানের ফুন্টশোলিংয়ে ড্রুক হোটেলের ভাড়া দৈনিক ৬০০ টাকা। শুনে শঙ্খ ঘোষ বললেন, তাহলে আর কম কী হল?

আমাদের বাড়ির সেদিনের আড্ডায় ঘটনাটা শুনে সুনীলদা বললেন, আমি তো দশ-কুড়ি টাকার হোটেলে বা লজেও থেকেছি।

দার্জিলিংয়ের 'সীমান্ত' গ্রামে এক তিব্বতি মহিলার বড় উঠোনওলা ছোট্ট হোটেলে কুড়ি টাকা ভাড়ায় আমিও থেকেছি, রাতের আহার শাকসবজি ডিমের ঝোল আর ধোঁয়া ওঠা ভাত। ঘুমের জন্য মোটামোটা চারখানা লেপ।

শুনে সুনীলদা বললেন, এই কলকাতা শহরে পার্ক স্ট্রিটের মতো জায়গায় আমি বিনা পয়সায় থেকেছি।

আমার কৌতূহলের উত্তরে সুনীলদা বললেন, সেদিন বাড়ি যাবার উপায় নেই, সকলে মিলে আমাকে অগত্যা বেলালের একদম ফাঁকা একঘরের বাসায় শুইয়ে দিয়ে চলে গেল। ছোট্ট ঘর। কিন্তু বিছানায় বেশ উঁচু গদি। সকালে বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখে রোদ পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল, দেখলাম চাদরের তলায় তোশকের বদলে বই। ঘরটাও নিচু, চালাঘর। বেড়ার তলা দিয়ে ঘরের বাইরে অনেক লোকের পা দেখা যাচ্ছে। মেয়েদের গলায়, কিন্তু পুরুষের ভাষায়, তারা মনে হয় আমার উদ্দেশেই গালিগালাজ করছে। ঘর থেকে বেরতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম বাইরে থেকে দরজায় তালা দেওয়া।

কাছেই দুই বাংলার প্রিয় কবি বেলাল চৌধুরী বসে হাতের গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। মুখে হাসি।

ঘরের অন্য প্রান্তে দুই নাতনি-সহ গৃহকর্ত্রী বীথিভাবি ও আরও কয়েকজন নিজেদের মধ্যে গল্পে মেতে ছিলেন। হঠাৎ বড় নাতনির উচ্চকণ্ঠ কানে এল, অমরেন্দ্ররে আমি এত ভালোবাসি, ইচ্ছা করে অরে বুকে কইরা রাখি!

শুনে তার ছোট বোন, দিদিমার বুকে আধোশুয়ে বুড়ো আঙুল চুষছিল, এক ছুটে

আমার বুকে এসে ছোট ছোট হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, আমার ইচ্ছা করে অমরেন্দ্ররে আমি বুকের কলিজা কইরা রাখি!

সুনীলদা সবটা দেখে বললেন, অমরেন্দ্র, এরা এখন তোমারই প্রেমিকা থাকুক, বড় হলে কিন্তু আমার।

কবিতা-পরিচয়

পাতিরামের স্টলে জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কবি ও কবিতা'র পাতা উল্টোচ্ছি। শঙ্খ ঘোষের নতুন কবিতা 'সুন্দর'-এ চোখ আটকে গেল। প্রথম পংক্তির ক্যাজুয়াল কথনশৈলীই তার একটা কারণ। শেষ পংক্তিতে পৌঁছেই মনে হল এই কবিতাটি নিয়ে 'কবিতা-পরিচয়'-এ আলোচনা না হলেই নয়। পাতিরাম থেকে শ্যামবাজারের দিকে পাঁচ-সাত মিনিটের হাঁটা পথে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট কার্তিক বোস লেনের সংযোগে একটা পোস্ট অফিস থেকে পোস্টকার্ড কিনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে 'সুন্দর' নিয়ে আলোচনার জন্য লিখলাম। তাঁর তখনকার যুগীপাড়া লেনের ঠিকানায়।

যেদিন লেখাটা দেবার কথা, সেদিন কথামতো শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে মধ্যরাতে গিয়ে দেখি ফুটপাতের রেলিংয়ে ভর করে সুনীলদা কোনওরকমে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছেন। লেখাটা কথামতো আনতে পারেননি বলে তাঁর আন্তরিক অনুতাপ সেদিন আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। একহাতে রেলিং ধরে কোমর ভেঙে দাঁড়িয়েও বললেন, কাল সন্ধেয় কফিহাউসে ওই কবিতার আলোচনা নিশ্চয়ই পৌঁছে দেবেন আমাকে।

পরদিন কফিহাউসে সন্ধের আগেই তাঁর লেখাটা যখন আমার হাতে দিলেন, তাঁর মুখ দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না আগের দিন তাঁর মাঝরাতের প্রায় ভাঙাচোরা সেই চেহারা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই লেখার প্রতিবাদেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অযাচিত লিখলেন আরও একটি আলোচনা।

অলোকরঞ্জনের লেখাটি প্রসঙ্গে সুনীলদা লিখলেন আরও একটি আলোচনা। এবার শুধু কবিতাটি নিয়ে নয়, কবিতা আলোচনার রীতি নিয়ে। লেখার সঙ্গে তাঁর চিঠি:

> ২১/৭/৬৬
> প্রীতিভাজনেষু,
>
> 'সুন্দর' কবিতাটি সম্পর্কে আমার আলোচনার পর অলোকবাবু যা লিখেছেন, আমি তার একটি উত্তর লিখে পাঠালুম। আগামী সংখ্যায় ছাপা হলে খুব খুশী হবো।
>
> আমার রচনাটির ভুল দেখিয়ে অলোকরঞ্জন যা লিখেছেন, শুধু তার উত্তর দেবার জন্যই আমি এটা লিখছি না, তার দরকারও ছিল না, কারণ, ওঁর লেখাটাও আমার ভালো লেগেছে, তবে, কবিতা আলোচনার যে পদ্ধতিতে অলোকবাবু বিশ্বাস করেন, তা ছাড়াও আর একটি আধুনিক

পদ্ধতি আছে, আমি তাতে বিশ্বাসী— যেখানে কবিতার প্রতিটি শব্দ বা মূল ভাবকে ডিসটার্ব না করে— শুধু কবিতার পরিমণ্ডলটাকেই নিবিড় করে ফুটিয়ে তোলার দিকে জোর দেওয়া হয়। এখনকার কবিতা আলোচনার রীতি কী-রকম হওয়া উচিত, তাই নিয়েও কিছু আলোচনা হওয়ার দরকার, পরে যদি এ সম্পর্কে অন্য কেউ লেখেন, খুব ভালো হয়।

ভালোবাসা জানবেন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এ লেখা যে ঠিক পরের সংখ্যায়ই ছাপা হবে তাতে আর সন্দেহ কী!

'কবিতা-পরিচয়'-এ শঙ্খ ঘোষের 'সুন্দর' ঘিরে আলোচনা, প্রত্যালোচনা, তারও পরবর্তী আলোচনাই শেষ ঘটনা নয়। তারও পর আছে। সে-ঘটনা অবশ্য শঙ্খ ঘোষের লেখা থেকেই আমি জেনেছি। তাঁর 'ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ' বইয়ের একটি লেখা থেকে:

বিকেলে অলোকের সঙ্গে কথা বলছি ঘরে বসে, হঠাৎ বেজে উঠল ঘন্টি। দরজা খুলে দেখি সুনীল। বাঃ, এ তো ভালো হলো, দুয়ের চেয়ে তিনে শুনেছি আড্ডা জমে ভালো। কিন্তু লম্বা বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকবার আগের মুহূর্তেই একটা ভয়ও ঢুকল মনে। জমবে, না কি ভাঙবে? সুনীল-অলোকের মুখোমুখি হয়ে যাওয়াটা এই মুহূর্তে কি ঠিক হবে? কোনো অপ্রিয়তা হবে না তো?

ভয়ের কারণটা হলো, কয়েকদিন আগেই 'কবিতা-পরিচয়' নামের এক পত্রিকায় ওদের বেশ দ্বৈরথ ঘটে গেছে। সুনীলের লেখা কোনো-একটি কবিতাবিচার পড়ে অলোক তার আদ্যন্ত বিরোধিতা করেছে, ওই লেখাকে তার মনে হয়েছে নিতান্তই 'সপ্রতিভ' এবং 'অগভীর', আর এই 'মৃদু ভর্ৎসনা'কে সবিনয়ে 'শিরোধার্য' করে নিয়ে সুনীল লিখেছেন তার এক জোরালো এবং স্মরণীয় উত্তর। ঘটনাচক্রে, যে-কবিতাটি নিয়ে এই বিসংবাদ, সেটি ছিল আবার আমারই লেখা।

এখন কী হবে? দুজনের থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে দুজন? আড়ে আড়ে কথা হবে? না, হলো না তেমন কিছু। দেখা হতেই অলোক সহাস্যে বলে: 'পড়েছি আপনার জবাব।' সুনীলের ঠোঁটে সামান্য একটু লাজুক হাসি: 'ইচ্ছে করলে আপনিও আবার লিখবেন।' তার পর শুরু হয় স্বাভাবিক গল্পগুজব। কবিতা কাকে বলে, কীভাবে পড়া উচিত কোনো কবিতা, এ নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রুচির মানুষ এই দুজন সমকালীন কবি, কিন্তু তাতে কি বন্ধুত্বের কোনো বাধা হয়? হওয়া ঠিক? হয় না যে সেটা, তা তো দেখাই গেল এখানে। আর, তারই একটা প্রকাশ্য রূপ তখন ফুটে উঠছে সেই পত্রিকাটিকে ঘিরে, 'কবিতা' আর 'পরিচয়' নামদুটিকে জড়িয়ে যে-পত্রিকার নাম হয়েছে 'কবিতা-পরিচয়', যে-পত্রিকায় একই কবিতাকে ভিন্ন ভাবে পড়ছেন ভিন্ন ভিন্ন মানুষ। জমে উঠেছে, একই সঙ্গে, কবিতা পড়ার আর বন্ধুজনদের মধ্যে তর্কবিতর্কের স্বাদু এক পরিবেশ।

আর এসব ঘটিয়ে তুলছে তখন অমলিন এক স্বপ্নদ্রষ্টা যুবক। যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্যের পড়াশোনা করতে করতেই তার নেশা ধরে গেছে একটা

কোনো পত্রিকার ভাবনায়, যা হয়ে উঠবে 'কাব্য-সমালোচনার মাসিক সংকলন'। খুবই এর দরকার বলে মনে হচ্ছিল তার, কেননা কবিতাকে যে কেবল কবিতা হিসেবেই পড়া যায়, পড়ে আনন্দ পাওয়া যায় বা আলোড়িত হওয়া যায়, তার সৃষ্টিসূত্রের কথা ভেবে উত্তেজিত হওয়া যায়, আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য পড়ে তা যেন আর বোঝাই যায় না। কোনো কি পথ তৈরি হতে পারে না সে-বোধের দিকে? এ-রকম এক ভাবনা নিয়ে তরুণ ওই ছাত্র তার উদ্যমে আর উৎসাহে তখন গড়ে তুলছে সমভাবুকদের এক দল, যে-দলে প্রায় সকলেই তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো।

সফলও হলো তার স্বপ্ন। বড়োমাপের কাগজের ষোলো পৃষ্ঠা, নিরাভরণ ঘিয়ে রঙের মলাটে শাদাসিধে হরফে নামটা শুধু ছাপা, ভেতরে পাঁচটি মাত্র কবিতার আলোচনা। এক গরমের দুপুরে সেই পত্রিকাটি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যাশিত আদর হলো তার, চিঠি বা প্রশ্রয় বা তর্ক নিয়ে উপযাচক হয়ে এগিয়ে এলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে বা অম্লান দত্তের মতো মানুষজনেরা। সফলতায় দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। সেই যুবক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর চোখে আর ঘুম নেই, পায়ে আর বিরাম নেই, নতুন নতুন ভাবনার আর ক্ষান্তি নেই।

কষ্টিপাথরে মহাশ্বেতা-সুনীল

মহাশ্বেতা দেবী নিজের গল্প পড়বেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পড়বেন তাঁর কবিতা। একঘণ্টার একটা ভিসিডি। চোখের সামনে পড়তে দেখা যাবে। সাহিত্য পত্রিকার পাঠকের পক্ষে এর চেয়ে ভালো উপহার আর হয় না বলেই আমার ধারণা। পাক্ষিক 'কালের কষ্টিপাথর'-এর প্রথম সংখ্যার সঙ্গে পাঠকদের জন্য এরকমই একটা উপহার দেবার কথা ভাবছি তখন।

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পপাঠ ভিডিও রেকর্ডিং করা হল, তার পর সুনীলদার কবিতাপাঠ। আমি চেয়েছিলাম সুনীলদা পনেরোটা কবিতা পড়বেন। কিন্তু এগারোটা পড়ার পর— আমার পছন্দের কোনও কোনও কবিতা তখনও পড়া হয়নি, কথাবার্তায় দু'জনেই কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলাম। অনেকদিন পর দেখা হলে যা হয়। এমনকী ক'বছর পরে সুনীলদার বাড়িতে এলাম তা নিয়ে দু'জনের দু'রকম স্মৃতি। অনেক দিন পর এসে এমন সামনাসামনি তার জীর্ণশীর্ণ মুখের চেহারা প্রথমেই আমি দেখে আঁৎকে উঠেছিলাম। কথায় কথায় অনেকটা সময় গেল। সুনীলদাকে উঠে তখনকার মতো ভেতরে যেতে হল, আমারও অফিসের কর্মসূচির চাপ ছিল। কথা হল এর মধ্যে আরেকদিন ভিডিও অপারেটরকে পাঠিয়ে বাকি চারটে কবিতা রেকর্ড করিয়ে নেব।

তার আগেই অবশ্য মহাশ্বেতা দেবীর 'স্তন্যদায়িনী' ও আমার পছন্দ করা সুনীলদার এগারোটি কবিতার ভিসিডি-সহ 'কালের কষ্টিপাথর' প্রকাশিত হয়েছে। ৩০ টাকার দামের পত্রিকার সঙ্গে বিনামূল্যে মহাশ্বেতা দেবী ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ও কবিতা পড়ার একঘণ্টার ভিসিডি। প্রভূত অর্থ ব্যয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে সংবাদপত্র পরিবেশকের কাছ থেকে চল্লিশ হাজার কপির অর্ডার পাওয়া গেল। সেইমতো সযত্ন মুদ্রিত পত্রিকা ভিসিডি-সহ পরিবেশকের মারফৎ সারা রাজ্যে

ছড়িয়ে পড়ল। পনেরো দিন পর দ্বিতীয় সংখ্যা বেরবার সময় বাজার থেকে অবিক্রিত আঠাশ হাজার কপি ফেরত এল। সেই দুঃখ ও ক্ষোভের কার্যকারণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। একদিকে মননশীল সাহিত্যমনস্ক ও দীক্ষিত পাঠকের প্রশংসা ও আরেকদিকে বিপুল আর্থিক ক্ষতির দায়ভার নিয়ে যখন প্রতি পক্ষে একটার পর একটা সংখ্যা প্রকাশ করে যাচ্ছি, তখন একদিন সুনীলদার ফোন এল। আমি যে আরও চারটে কবিতা পড়াতে চেয়েছি সেটা এত দিনেও মনে আছে দেখে একটু অবাকই হয়েছিলাম। কালই তাঁর অনেক কবিতাপাঠের আয়োজন করা হচ্ছে, আমি কি সবটাই রেকর্ড করে নিতে চাই?

বললাম, আর তেমন কাজে লাগবে না, তবুও ভালো ভিডিও অপারেটর পাঠিয়ে রেকর্ডিং করে নিতে তো পারিই।

সুনীলদা ফোনে ভিডিও অপারেটরকে কবিতাপাঠের স্থানকাল ও পথনির্দেশ বুঝিয়ে দিলেন।

পরদিন ভিডিও অপারেটরের কাছে শুনলাম, সুনীলদার সেই স্বরচিত কবিতাপাঠের সভা ছিল ভিড়ে ভিড়াক্কার।

একবার 'কালের কষ্টিপাথর'-এ ওঁর একটা বা দুটো গল্প পুনর্মুদ্রণের অনুমতি চেয়ে চিঠি পাঠিয়ে অপেক্ষায় আছি, কম্পোজিং বিভাগে তখনও পাঠানো হয়নি। ছাপতে পারি কি না জানতে চেয়ে পত্রবাহকের হাতে এক লাইনেই তাঁর উত্তর এল—অবশ্যই পারো।

এর বেশ কয়েকদিন আগেও একবার বিদেশে সম্পাদক-সম্মেলনে যাবার আগের দিন অফিসের সহকর্মীর আব্দার, এবার বইমেলায় দুয়েকটা নতুন বই হলে ভালো হয়। তখনই মনে হল, পাঁচ টাকায় পাঁচটি সিরিজে প্রখ্যাত লেখকদের পাঁচটি করে গল্পের একেকটি সংকলন অমূল্য কিছু বাংলা ছোটগল্প যতটা সম্ভব বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারলে কেমন হয়! করার পরিকল্পনা তখনই মনে মনে পাকা করে ফেললাম। সেই মর্মে একটা চিঠি লিখে কম্পোজ করতে পাঠিয়ে বিভিন্ন লেখকদের ফোন করতে থাকি। মহাশ্বেতা দেবী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, রমানাথ রায়, অমর মিত্র প্রমুখ সব লেখকই আনন্দের সঙ্গে আমার এই পরিকল্পনায় সায় দেন। চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে লিখিত সম্মতি জানান। সপ্তাহ দুয়েক পর দেশে ফিরে দেখি সুনীলদার চার লাইনের ভূমিকা:

> শ্রী অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর মাথাটি বহু পরিকল্পনায় ঠাসা। বাংলায় একটি রুচিসম্পন্ন ভ্রমণ পত্রিকার খুব অভাব ছিল। তাঁর সম্পাদনায় 'ভ্রমণ' আমাদের মুগ্ধ করেছে। এখন তাঁর ইচ্ছে হয়েছে বাংলা ছোট গল্পকে জনপ্রিয় করা এবং অল্প দামে বহু পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সত্যিই তো, বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প বিশ্ব মানের। অমরেন্দ্রর এই নতুন প্রয়াসও আশা করি সার্থক হবে।
>
> কলকাতা — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
> ১৯ জানুয়ারি, ২০০৪

অধরা সন্ধ্যা

এর কয়েক বছর পর বেস্পতিবারের এক সন্ধেয় আসবেন আমাদের বাড়িতে, আড্ডা হবে দুজনে একান্তে। বয়জ্যেষ্ঠ এক বন্ধুর দেওয়া ধোঁয়ার গন্ধমাখা মল্ট হুইস্কি লাগাবুলিন ও ছোট মাছ ভাজা— এই ছিল আড্ডার পানাহারের মেনু। সেদিন বিকেলের দিকে ফোন এল, আজ শরীরটা একটু বেজুত লাগছে। আজকের সন্ধেটা বাদ দাও।

এভাবে পরপর দুই বৃহস্পতি পাকা হয়েও শেষ অব্দি তা ভেঙে গেল। তৃতীয় বৃহস্পতি সুনীলদার আসা চূড়ান্ত করে আমিই আগাম ফোন করি। উত্তর এল: একটা সাহিত্য সম্মেলনের নেমন্তন্নে ঘানায় যেতে হচ্ছে। ফিরে এসে দেখা হবেই। তোমার লাগাবুলিন চাখতে হবে।

সন্ধ্যা অধরাই রয়ে গেল।

‘কালের কষ্টিপাথর’, হৈমন্তী সংকলন ১৪২৬